স্বপ্নের নাগরদোলায় দুলতে দুলতে স্বপ্নপুরীতে মাত্র পৌঁছেছি। এমন সময় এক ডাকিনীর তীক্ষ্ম চিৎকারে নিদ্রার জগৎ থেকে রূঢ় বাস্তবে পদার্পণ করলাম। মহারাণী এবং শাহজাদার নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটানোর আগেই ডাকিনীর টুটি চেপে ধরলাম। পৌনে আটটা। গ্রীষ্মের সূর্য ইতিমধ্যেই প্রায় মধ্য গগন ছুঁই ছুঁই। কিন্তু যার নিদ্রাপুরীতে পাড়ি জমাতে জমাতেই রাত দ্বিপ্রহর হয় তার জন্য এটা এক প্রকার ভোরের শামিল। আঠার মতো সেটে থাকা চোখের পাপড়িগুলোকে ফাঁক করে ওয়াশরুমের দিক ঠাহর করি। প্রাতঃকর্ম সারতে সারতে আরেকটা চুটকি ঘুম হয়। সকালে শরীরে পানি লাগানো আমার স্বভাব নয়। এই আছি এই নাই দাঁতে বাহারি সারি দুইখানিতে ব্রাশের দুই ঘষা দিয়ে, কোনোক্রমে শার্ট-প্যান্টের ফাঁদে নিজেকে জড়িয়ে, জুতায় পা দুইখানা গলিয়ে, একখানা সস্ড়া কালো ব্যাগ বগলদাবা করে অ্যাপার্টমেন্টের দরজা খুলে করিডোরে বেরিয়ে আসি।

হেড়ে গলার সম্বোধনে চমকে উঠি। মাঝবয়েসী ইনডিয়ান ভদ্রলোকটিকে চিনতে পারি। আমাদের তিন চারটি অ্যাপার্টমেন্টের পরেই তার বাস। পুত্রের সংসারে আছেন। অল্প কিছুদিন ধরেই তাকে দেখছি। প্রায়ই লম্বা করিডোরে চঞ্চল পায়ে হাঁটাচলা করেন। দেখলেই হই হুলোড় ফেলে দেন। বেচারীর বোধ হয় আলাপ করার মানুষ নেই। আমি মধ্যম মানের আলাপী। কিন্তু এই সাত সকালে তার সঙ্গে আলাপে জড়ানোর বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই। মুচকি হেসে কেটে পড়ছিলাম। কাঁধে থাবা পড়তেই বাধ্য হয়ে থামতে হলো।

"কাল ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম। বাড প্রেশার অনেক কম। ডাক্তার বললো, নো চিন্তা। হাঃ হাঃ হাঃ। বলেছিলাম না তোমাকে? হাটার কতো ফল।"

তার ইংরেজি অতিশয় দূর্বল। অধিকাংশ আলাপ হিন্দিতেই চলে। আমি কিছু হিন্দি বুঝলেও আদৌ বলতে পারি না। তবুও হোঙ্গে-দেঙ্গে বলে চালিয়ে যাই। আপাতত বিড়বিড়িয়ে কিছু বলে কেটে পড়লাম।

ডাউন-টাউন টরোন্টোতে কাজ। পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন ব্যবহার করি। যেতে ঘন্টা দেড়েক লেগে যায়। দাঁড়িয়ে এই ভদ্রসন্তানের কেচ্ছা শুনতে গেলে দিন গড়িয়ে যাবে। ড্রাইভ করার কথা কখনো মনে আসেনি তা নয়। কিন্তু অফিসযাত্রীদের গাড়ির ভীড়ে রাস্তায় তিল ধারণের জায়গা থাকে না। ঢিলে তালে চলতে চলতে ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গে। পার্কিংয়ের খরচে পকেট ফুটো হয়। তার উপর রয়েছে গাড়ির পরিবর্ধিত ইনশিওরেন্সের ধাক্কা। আমার গণপরিবহনই সই। এখানে তার নাম 'টিটিসি' (TTC)।

আমার যাত্রা শুরু হয় বাসে। তিনবার ট্রেন পাল্টে তবে গন্তব্য। বাসের জন্য আজ লম্বা লাইন পড়ে গেছে লক্ষ্য করলাম। একেকদিন একেক রকম হয়। অনেক গবেষণা করেও জনগণের মতিগতি বুঝতে পারিনা। বাস একটা থামতেই হুড়োহুড়ি লেগে গেল। যদিও সকলেই চেষ্টা করে ভদ্রতা বজায় রাখতে তবুও একখানা সিটের জন্য দুই চারজনকে অল্পবিস্তর ঘাই -গুতা দেয়ায় অপরাধটা কোথায়?

আমার কপালে আজ সিট জুটলো না। কোনক্রমে যে এক কোণে ঠাঁই পেলাম তাতেই সন্তুষ্টি অনুভব করি। উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম, ঈশান-নৈর্ঋত সবদিকেই মানব সন্তানের উপস্থিতি। কেউ ধলা, কেউ কালা, কেউ কিঞ্চিৎ রঙচটা। ঠিক সামনেই দাঁড়িয়ে তাল গাছের মতো এক কৃষ্ণাঙ্গ, তার চাছাছোলা চান্দি বাসের ছাদ প্রায় ছুঁয়ে যায়। তাল গাছের বগল ঘেষেই একটি নিরীহ দর্শন বীণা। নারী-পুরুষ, তরুণ-তরুণী, শিশু সব মিলিয়ে বর্ণ, আকার এবং প্রকৃতির বিচিত্র এক সন্ধিক্ষণ। মনটা অকারণেই যেন ভালো হয়ে ওঠে। এমন অপেক্ষাকৃত শান্তিময় বর্ণের সমাবেশে সাধারণ মানুষের হৃদয় মহামিলনের গান

গেয়ে উঠবে সেটাই স্বাভাবিক। এই বৃহত্তর অস্তিত্বের অংশ হতে পেরে নিজের অজান্তেই যেন কিছুটা অহংকার বোধ করি।

সকালের অফিসগামী গাড়ির ভিড় ঠেলে থমকে থমকে এগিয়ে চলে আমাদের বাস। পরের ষ্টেশনে আরো একঝাঁক মানুষের আগমন, চাপাচাপি, উষ্ণতা। সেই ভিড়ের মধ্যেও আমাকে শনাক্ত করতে অসুবিধা হলো না সেলিমের, ঠেলতে ঠেলতে পাশে চলে এলো।

"কেমন আছেন ভাই? অফিসে চললেন? ভালোই আছেন আপনি ভাই। আমার কি দূরবস্থা দেখেন।"

সেলিম ঢাকাতে কোনো একটি বড় প্রতিষ্ঠানের কমপিউটার সেকশনের হর্তাকর্তা ছিল। বয়স যদিও অল্পই। কি কারণে এই দূর দেশে আগমন জানা নেই। কিন্তু এখানে আসা পর্যন্ত নানান ঘাটের পানি খেয়ে চলেছে সে। এখন চলেছে স্কারবোরো মলে। সেখানে একটি দোকানে কাজ করে সে। আমি যথেষ্ট অপরাধী বোধ করি। যদিও জানি অল্প কয়েকখানি সিঁড়ির ধাপ টপকাতে আমাকে যে অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে গত একটি দশক তার কিয়দংশও এই তীক্ষ্ণ বুদ্ধির যুবকটি এখনো উপলব্ধি করেনি।

সেলিম কণ্ঠে তিরস্কার নিয়ে বললো, "আমার জন্য কিছুই করলেন না ভাই।"

আমার সুযোগ যে কতো সংকীর্ণ তা সেলিমকে বোঝানোর চেষ্টা করি না। এক সঙ্গেই বাস থেকে নামি। দুজন দুই দিকে চলে যাই। আমি সিঁড়ি টপকে উপরে উঠি ট্রেন ধরতে। এই ট্রেন আমাকে নিয়ে যাবে কেনেডি সাবওয়ে স্টেশনে। আন্ডারগ্রাউন্ড রেল। কেনেডিতে ট্রেন থেকে নেমেই জানবাজি রেখে সিড়ি টপকে নিচে নামি। ট্রেন ধরতে পেরে মুখে হাসি ফোটে। অল্পক্ষণ পরেই স্টেশন পেছনে ফেলে সংকীর্ণ টানেলে প্রবেশ করে পাতালপুরীর যন্ত্রশকট। ঝিকির ঝিক, ঝিকির ঝিক। ভেতরের আলোকিত পরিবেশে চারদিকে দৃষ্টি বোলাতে নজরে পড়ে অসংখ্য অফিস যাত্রীদের সহিষ্ণু মুখগুলো। চায়নিজ,

শ্বেতাঙ্গ, দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয় এবং অল্প কিছু কৃষ্ণাঙ্গ। সুবেশী নর এবং নারীদের ভিড়ে মিশে গিয়ে আতিপতি করে হাতলের সন্ধান করি। প্রায়ই কঠিন ব্রেক কষে ড্রাইভাররা, হাতলে হাত জড়িয়ে না থাকলে হুমকি খেয়ে পড়ার সম্ভাবনা দৃঢ়। খুঁজে খুঁজে সুন্দরী রমণীদের শরীরে হুমড়ি খেয়ে পড়ার এক অভাবনীয় প্রতিভা আবিষ্কার করার পর হাতল ধরার ব্যাপারে আমি বিশেষ রকম মনোযোগী হয়ে উঠেছি।

সাবওয়েতে প্রায়ই পরিচিত মানুষদের মুখোমুখি পড়ে যেতে হয়। ঘন ঘন কাজ পাল্টানোর ফলে পরিচিত মানুষের সংখ্যা দ্রুতহারে বেড়ে চলে। যদিও ঘনিষ্ঠতা হয় অল্পই। ক্ষ্যাপে কাজ করার এটাই অসুবিধা। কপালের কি লিখন, আজ খুঁজে পেতে রজনের মুখোমুখিই পড়লাম। সেও বয়সে আমার চেয়ে তরুণ। কাজ নিয়েই কানাডা এসেছিল বহু বছর আগে। ঝানু হয়ে গেছে। তার একটিই বদঅভ্যাস, সে আচমকা অদ্ভুত সব প্রশ্ন করে বসে। আজ আমাকে দেখেই সে ফট করে জানতে চাইলো, "ঘন্টায় কতো করে দেয় তোমাকে?"

বিমূঢ় হই। নারীর বয়স আর পুরুষের বেতন এই দুটি তথ্য যে জানতে চাইতে হয় না, এ তো দুধের শিশুও জানে। কোনো এক অজানা কারণে ইনডিয়ান ছেলেগুলো এসবের ধার ধারে না। তারা প্রথম পরিচয়েই মানুষের বেতন জিজ্ঞাসা করে বসে থাকে।

রজনের এই আচমকা প্রশ্ন কয়েকদিন আগের একটি ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। চতুর্বর্ষীয় পুত্র হঠাৎ করেই নিজ পৌরুষত্ব নিয়ে সচেতন ও কৌতুহলী হয়ে উঠেছে লক্ষ্য করলাম। হঠাৎ তার উত্তেজিত হই চই শুনে দৌড়ে গেলাম। সে তার অন্ডকোষ চাপতে চাপতে চিৎকার করছে, "আব্বু, দেখো দেখো, আমার এখানে বল আছে। তোমার আছে?"

রজন উত্তর না পেয়ে একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলো।

তাকে নিবৃত্ত করতে বিড়বিড়িয়ে কিছু একটা বলে এড়িয়ে গেলাম।

আমার ষ্টেশন এসে গেছে। বর। এখানে ট্রেন পাল্টাতে হবে আবার। ছুট ছুট। সিঁড়ি টপকে নিচে নামতে হয়। দূর থেকেই কানে বাজে গিটারের ধ্বনি। একটি পুরুষালি কণ্ঠস্বর গভীর আবেগে গান গাইছে। সুর এবং বেসুরের বাঁধ মানার প্রয়োজন তার নেই। তাকে আমি প্রায়ই দেখি। আরো অনেক ভিখারি শিল্পীর একজন সে। কেউ গান গায়, কেউ বাদ্য বাজায়, কেউ সুর তোলে বাঁশিতে। কারো হৃদয়ে আলোড়ন উঠলে থমকে দাঁড়িয়ে দান করে যায়। এই অধমের অর্থে এমনই আসক্তি যে, একটি সিকিও কখনো এই দরিদ্র শিল্পীদের দান বাক্সে পড়েনি। নিজেকে আজ হঠাৎ করেই খুব ছোট মনে হয়। মাথা নিচু করে দ্রুত পাশ কাটিয়ে যাই। মানিব্যাগের প্রত্যন্ড় কোনো প্রান্ড়রে জমতে থাকা ভাঙতি বের করতে করতে ট্রেন মিস হবে। মেজাজটা খারাপ হবে।
বস্তুত আলস্যের জয় হয়। কিন্তু অচেনা-অজানা ভিখারি শিল্পীগুলোর প্রতি প্রচুর শ্রদ্ধাবোধ অনুভব করি।

আরেকটি সংক্ষিপ্ত ট্রেনযাত্রার শেষে যে স্টেশনে পদার্পণ করলাম তার নাম যথার্থ অর্থেই রাজকীয়, কিং। আবার হুটোপুটি, লুটোপুটি, ভিড় ঠেলে সংকীর্ণ সিড়ি বেয়ে আলোকিত জগতে প্রবেশের জন্য সবাই উদগ্রীব। সিঁড়ির ওপর সিঁড়ি ঠেলে যখন রাস্তায় উঠে আসি, শরীরে শির শিরে ঘামের অনুভূতি হয়। প্রতিদিনের বরাদ্দ ব্যায়ামের কিয়দংশ এ চলাচলেই হয়ে যায়।

আমি কাজ করি টরোন্টো ডমিনিয়ন সেন্টারের কোনো একটি দালানে। এই এলাকাটি যেন একটি ফাইনানশিয়াল প্রাণকেন্দ্র। চারদিকে বিভিন্ন ব্যাংকের বহুতল আধুনিক ভবন। ডানে-বামে সামনে পেছনে স্কশিয়া ব্যাংক, টিডি ব্যাংক, সিবিসি, ব্যাংক অফ মনট্রিঅল....। চারদিকে অজস্র সুবেশী মানুষদের ভিড়। সকলেই ব্যস্ত পায়ে এগিয়ে চলেছে কর্মস্থলের দিকে। কতো অসংখ্য ব্যর্থ মনোরথ নবাগতদের দীর্ঘ নিঃশ্বাস এই আপাতদৃষ্টিতে নির্মল বাতাস বহন করে চলেছে কে জানে? অনেকের কথাই মানসপটে ভেসে ওঠে। শিক্ষা-দীক্ষার কমতি নেই; কিন্তু এই নতুন ভূমির অলিখিত নিয়ম-কানুনের মারপ্যাঁচে তাদেরকে নাম

লেখাতে হয়েছে দোকান, রেস্টুরেন্ট, কলকারখানায়। অপরাধ বোধটা আবার জাঁকিয়ে বসে।

ইয়াং স্ট্রট হচ্ছে টরোন্টোর জীবন কাঠি। অজস্র অফিস বিল্ডিং পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে থাকি নিজ কর্মস্থলের দিকে। সেখানে একটি চেয়ার ও ডেস্ক অপেক্ষা করে আছে আমার জন্য। কাছেই সিএন টাওয়ারের শুলের মতো তীক্ষ অবয়বটি যেন আকাশ ফুঁড়ে উঠে গেছে মধ্য গগনে। একটি নন্দনীয় দৃশ্য। আচমকা একটি শূন্য হ্যাট ঠিক আমার সম্মুখে এসে স্থির হয়। ধাতস্থ হয়ে তাকাতেই টুপিধারী শীর্ণ হাতটিও নজরে পড়ে। একটি ভিখারি। গৃহহীন। পথেই তার সংসার। বেশ কয়েকজনকে দেখেছি শুধু এই ছোট্ট এলাকাতে। আমার দেখা অধিকাংশই শ্বেতাঙ্গ। দুর্বোধ্য হলেও সত্য। অনেকের সঙ্গী থাকে বিশালদেহী সারমেয়। নিঃসঙ্গ এক গৃহহীন পুর"ষ ও একটি সারমেয় - দৃশ্যটি কাব্যিক হলেও সেখানে বিষাদই বেশি। এই দেশে সরকার নানাভাবে গৃহহীনদেরকে সাহায্য করার চেষ্টা করে বলে শুনেছি, তাদের প্রচেষ্টায় যে বিস্ড়র ত্রুটি আছে, স্বচোখে দেখছি। ভিক্ষা দিতে আমার বাধে। খুব সম্ভবত স্বদেশে যেমন দ্র"ত হারে এর বিস্ড়্রতি দেখেছি তাতে হৃদয়ে শংকা জাগে এই প্রথম বিশ্বেও সেই অবক্ষয়ের জয়যাত্রা শুর" হয় কি না।

আমার কর্মস্থলের দালানটিও বহুতল। ঠিক তার সামনেই আরেকজন গৃহহীনকে ফুটপাথের ওপর সটান শুয়ে থাকতে দেখলাম। সকালের উজ্জল রোদ তার শরীরে পরশ বুলিয়ে চলেছে। চোখ বন্ধ। ঠোটে তৃপ্তির হাসি। তার গৃহ নেই, এ উন্মুক্ত পথই তার গৃহ। বুকের মধ্যে আচমকা এক অদ্ভুত আলোড়ন ওঠে। ইচ্ছা হয় এই লেবাস খুলে বসে পড়ি তার পাশে। আমাদের চিরচেনা জগতের বেড়ি থেকে বের হয়ে একবারের জন্য হলেও অনুভব করি খোলামেলা ভাবটি।

আমি লোকটিকে দ্র"ত পাশ কাটিয়ে যাই। এলিভেটরের সামনে সংক্ষিপ্ত অপেক্ষা। পঁচিশ তলায় অফিস। সংরক্ষিত। জাদুর কার্ডের মন্ত্রবলে দুয়ারের পর দুয়ার উন্মুক্ত হয়, মহারাজের অপেক্ষামান ডেস্ক ও চেয়ারটি তাকে নীরব সম্ভাষণ

জানায়। কমপিউটারের মনিটরটির দিকে তাকিয়ে থেকে মুহূর্তের জন্য বিদ্বেষে প-াবিত হই। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, কি এক ঘানি টেনে চলেছি। কতো কি হওয়ার ইচ্ছা ছিল। সকল জল্পনা কল্পনার পরিসমাপ্তি এখানে। মস্তিস্কে আচমকা সঙ্গীতের মূর্ছনা শুনি - মোরা ধান ভাঙ্গি রে, মোরা ধান ভাঙি রে। আমার ডানে শাশা, রাশিয়া থেকে। বামে মুরালি, ইনডিয়া থেকে। তার ওপাশে বেথ, চায়না থেকে। ম্যানেজারের সঙ্গে ঝগড়া করে দুই পাতার একটি ইমেইলে লোকটির সম্বন্ধে বিস্তর আপত্তিকর কথা লিখে বান্ধবীকে পাঠানোর পরিবর্তে ভুলে বদমাশ ম্যানেজারকেই পাঠিয়েছিল। ভুল আবিষ্কার করার পর দ্বিতীয় আরেকটি ইমেইল পাঠাতে হলো আগের পত্রটি অবজ্ঞা করার অনুরোধ জানিয়ে। সেই সমস্যা তার অল্পে মেটেনি। ম্যানেজারটি শ্বেতাঙ্গ। তার ভাবভঙ্গিতে উন্নাসিকতা প্রকট। তাকে দেখলেই আমার পিত্তি জ্বলতে থাকে। মোরা ধান ভাঙি রে, মোরা ধান ভাঙি রে।

বিতৃষ্ণা নিয়েই কাজে নামি। জীবিকার জন্য কতো কিছু করে মানুষ। আমি ভাগ্যবান। একটি নরম আসনে বসে কিবোর্ডে আঙুল চেপে যাই। কিন্তু হৃদয় তা বোঝে না। দুর্ভাগাদের সঙ্গে কি সর্বক্ষণ তুলনা চলে? সকাল এগারোটার দিকে শাহজাদার ফোন আসে। "হ্যাপি অফিস বাবা!"